PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-13, No.-1, May 2022

বাংলায় কৃষির বিবর্তনঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

ডঃ লক্ষ্মণ চন্দ্র পাল [1*]

1* সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, বিধান চন্দ্র কলেজ, রিশা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত.

সারাংশ

কৃষিকাজ বাংলার প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এখানে অত্যন্ত গতানুগতিক ভাবে এই কাজ পরিচালিত হত। সেকেলে কিছু উপকরণ ব্যবহৃত হত কৃষিকাজে। সময়ের সাথে সাথে এখানকার কৃষির চরিত্রে পরিবর্তন আসে। ১৯৫০ এর দশকে কৃষকেরা হাতে পায় রাসায়নিক সার ও ১৯৬০ এর শেষভাগে উচ্চফলনশীল বীজ, উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্রপাতি, কীটনাশকসহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষি উপকরণ। জোয়ার আসে উৎপাদনে। ফলে শুরু হয় সবুজ বিপ্লব। বিভিন্ন ফসল বিশেষ করে দানা শস্যের উৎপাদন ২-৩ গুন বেড়ে যায়। ২০১০ এর দশক থেকে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতে থাকে বিভিন্ন ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি। এই সব উপকরণের ব্যবহারে কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে বটে কিন্তু খরচও বেড়েছে অনেক। সে সঙ্গে বাংলা হারিয়েছে তার বিশুদ্ধ পরিবেশকে। উৎপাদনের এই ধারা বজায় রেখে পরিবেশের পুনরুদ্ধারে কৃষি উপকরণ গুলির বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুসংহত ব্যবহার দরকার।

ভুমিকা

বাংলা ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কৃষিপ্রধান রাজ্য। বহু প্রাচীনকাল থেকে এরাজ্যে কৃষি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০০ বছর আগে বর্ধমান জেলায় ধান, গম,আখ, মুগ, মসুর, প্রভৃতি চাষ হতো (গোপাল চন্দ্র সিনহা-২০০১)। সমুদ্র গুপ্তের আমলে ও গাঙ্গেয় বাংলায় ধান, গম, আখ, মশলা প্রভৃতি উৎপাদনের কথা জানা যায়। মিশ্রচাষ এবং শস্যবর্তনের ও প্রচলন ছিল সেকালে। তবে অত্যন্ত সেকেলে পদ্ধতিতে পশু ও পেশি শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হত তখনকার কৃষিকাজ। ফলে, ফসল উৎপাদনের হার ও পরিমাণ ছিল খুব কম। অতি সাধারণ পদ্ধতিতে তৈরি গোবর-সার, পচা কৃষি-আবর্জনা, পুকুরের পাঁক, মরা জীবজন্তুর দেহ, পশুর মল-মুত্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো সার হিসেবে।

স্বাধীনোত্তর কালে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ক্রমে ক্রমে জমিতে জলসেচ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৬০ এর দশকে বাজারে আসে উচ্চফলনশীল বীজ এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি। চালু হয় আধুনিক সেচ ব্যবস্থা। এগুলির সুসংহত ব্যবহারে ফসল বিশেষ করে দানা শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২-৩ গুন বেড়ে যায়। বাংলাসহ সারা দেশে আসে সবুজ-বিপ্লব। কিন্তু রাসায়নিক সার ও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারে ফসলে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব বাড়ে। শুরু হয় রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার। সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে এগুলির ব্যবহারের মাত্রা। ২০১০ এর দশকে কৃষকেরা হাতে পায় বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতি। কৃষি-শ্রমিকের অভাব, একক পরিবারের প্রাধান্য প্রভৃতি কারনে সংক্রমণের মত খুব কম সময়ে তা ধনী-দরিদ্র সকল কৃষকের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জমি চাষ থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই শক্তি চালিত যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার চোখে পড়ে। এতে কাজের গতি বাড়ে তাই খানিকটা কমে আসে কৃষিকাজের খরচ। ফলে সামান্য বৃদ্ধি পায় কৃষকের নিট মুনাফা।

ফসল উৎপাদনে সবুজ-বিপ্লব দেশে অভূতপূর্ব সাড়া ফেললেও পরিবেশের স্বাস্থ ও উৎপাদনের ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়। সময়ের সাথে সাথে রাসায়নিক সারের উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ কমতে শুরু করে। প্রথমদিকে এক কেজি রাসায়নিক সার ব্যবহার করে যে পরিমাণ বেশি উৎপাদন পাওয়া যেত তা পেতে এখন দুই বা তিন কেজি সার দিতে হচ্ছে (উৎস-ক্ষেত্র সমীক্ষা)। সমান্তরালে বাড়াতে হচ্ছে কীটনাশকের পরিমাণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ বাড়িয়ে ও উৎপাদন বেশি পাওয়া যাছে না অর্থাৎ দেখা দিচ্ছে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান তত্ত্ব। এর ফলে কৃষকদের নিট মুনাফা যেমন কমছে তেমনি দফারফা হচ্ছে পরিবেশের। দুষিত হচ্ছে জল, মাটি, বায়ু। ফসলের মধ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবেশ করছে মানব শরীরে। ক্রম-পুঞ্জিভুত এইসব রাসায়নিকের প্রভাবে মানুষ নতুন নতুন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রচনাটি তৈরির জন্য ২০২০-২১ সময়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা ও গবেষণাগার পরীক্ষা থেকে সংগৃহিত তথ্য, সেগুলির গণনা এবং প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কৃষির পর্যায় সমূহ –উৎপাদনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলার কৃষির পর্যায়কে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় বা গতানুগতিক কৃষি পদ্ধতি। দ্বিতীয় পর্যায় বা আধুনিক কৃষি পদ্ধতি এবং তৃতীয় পর্যায় বা যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি। প্রথম পর্যায়ে অতি সাধারণ এবং সেকেলে পদ্ধতিতে কৃষিকাজ চলত। ১৯৬০ এর দশকের শেষদিকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে এরাজ্যে ও সবুজ বিপ্লবের সূচনা হলে কৃষির দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু হয়। আধুনিক পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহারে কৃষির বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে এই পর্যায়ে। সাম্প্রতিক কালে ২০১০ এর দশক থেকে শুরু হয় কৃষির তৃতীয় বা যান্ত্রিক পর্যায়।

গতানুগতিক পর্যায়– জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে সবুজ-বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সময় বাংলায় কৃষির গতানুগতিক পর্যায় নামে পরিচিত। সেই সময় ধান, গম, সরষে, কলাই, মসুরী, কুর্তি, কচু, আলু, আদা, বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি প্রভৃতি ছিল বাংলার প্রধান ফসল। গৃহপালিত পশু দেখা যেত সব বাড়িতে। কৃষি ছিল সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতি নির্ভর এবং পশু ও পেশি শক্তির দ্বারা পরিচালিত। কৃষিতে কোন রাসায়নিকের ব্যবহার ছিল না। ছিল না গুনগত মানের কোন সার। গৃহপালিত পশু-পাখির মল-মুত্র ও পচা কৃষি-আবর্জনা ব্যবহৃত হতো জমির সার হিসেবে। ক্রমে ক্রমে সার হিসাবে পচা ডাল-পাতা, পুকুরের পাঁক, সবুজ-সার, মরা জীব-জন্তুর দেহ, হাড়, খোল, কমপোস্ট, বাড়ির ব্যবহৃত আবর্জনার সার প্রভৃতির ব্যবহার ও চোখে পড়ে। ফসল উৎপাদনে (৫-২৫) কুইন্টাল/একর সার ব্যবহৃত হত। তবে কোন কোন ফসল যেমন মসুরি, কলাই, কুর্তি প্রভৃতিতে কোন রকম সারের ব্যবহার ছিল না। কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হত গরু-মহিষের মুত্র, উনুনের ছাই, হুঁকোর জল, নিমপাতা বা তামাকপাতা সিদ্ধ জল (উৎস - ক্ষেত্র সমীক্ষা)। তাই কৃষি ছিল সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব এবং জৈব-প্রকৃতির। জলের অভাবে মুলত বর্ষাকালেই জমিতে চাষ হত। প্রয়োজনীয় সার ও জলসেচের অপ্রতুলতার কারনে ফসল উৎপাদনের হার ও পরিমাণ ছিল বেশ কম।

সারনী-১ -গতানুগতিক পর্যায়ে বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন (প্রধান) ফসলে ব্যবহৃত জৈব সারের পরিমাণ

উৎপাদিত ফসল	ধান	গম	আলু	তিল	আদা
ব্যবহৃত সারের পরিমাণ (কুইন্টাল/একর)	১৫	১৫	২৫	০৫	২৫

উৎস -ক্ষেত্র সমীক্ষা।

আধুনিক পর্যায় – স্বাধীনোত্তর কালে দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়। জমিতে একাধিক বার ফসল উৎপাদনের লক্ষে সরকার সেচ ব্যবস্থার উন্নতিতে মনোনিবেশ করে। নেওয়া হয় বিভিন্ন পরিকল্পনা। একে একে গড়ে ওঠে দামোদর (১৯৪৮), ময়ূরাক্ষী (১৯৫৫), কংসাবতী

(১৯৫৬), তিস্তা (১৯৭৬-৭৭) প্রভৃতি জলসেচ প্রকল্প। বাংলার বিরাট এলাকা সেচের আওতায় চলে আসে। বাড়তে শুরু করে ফসল উৎপাদন।

এদিকে, ১৯৫০ এর দশকে বাংলার বাজারে আসে রাসায়নিক সার; অ্যামোনিয়াম সালফেট। লবণের মত দেখতে তাই বাংলায় ইহা নুন-সার নামে পরিচিত ছিল। প্রথমদিকে অনেকেই এর ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন না। চাষিদের সার ব্যবহারের এই অনীহা দূর করতে ১৯৫৩-৫৪ সালে Fertilizer distribution Scheme নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। চাষিরা কৃষি-অফিস থেকে ঋণ হিসেবে তখন সার পেতেন এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে সেই ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ পেতেন। এইভাবে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ শুরু হয় ধান-জমিতে। প্রথম ব্যবহারে ধানের উৎপাদন হঠাৎ করে অনেক বেড়ে যায় (উৎস -ক্ষেত্র সমীক্ষা)। কৃষকেরা অবাক হয়ে যান। খুব কম সময়ে তাই এই সার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ষাটের দশকের শেষদিকে (১৯৬৭-৬৮) বিজ্ঞানী ডঃ নরম্যান বোরলগ ও ভারতের বিজ্ঞানী ডঃ স্বামীনাথনের হাত ধরে দেশে সবুজ-বিপ্লবের সূচনা হয়। বাজারে আসে উচ্চ-ফলনশীল বীজ সহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ। আসে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার যেমন- Urea, DAP, CAN, Potato and Pady mixture, NPK 10-26-26 প্রভৃতি। ব্যবস্থা হয় স্বল্প সুদে কৃষকদের ঋণদানের। জোর দেওয়া হয় জলসেচ এর ব্যবহারে। এর ফলে কৃষি ফসল বিশেষ করে দানা-শস্যের উৎপাদন (২-৩) গুন বেড়ে যায় ।

সারনী-২ বিভিন্ন (প্রধান) ফসলে বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ

উৎপাদিত প্রধান ফসল		আমন ধান	বোরো ধান	গম	সরষে	আলু
ব্যবহৃত সারের গড় পরিমাণ (কেজি/একর)	এন-পি-কে	৩০	৩৫	৩০	৩০	৩০০
	ইউরিয়া	৩০	৩০	২০	২০	৪০
উৎপাদন বৃদ্ধি (কুইন্টাল/একর)		১৫	১৩	০৬	০৪	৫০

উৎস -ক্ষেত্র সমীক্ষা।

এদিকে কৃষির সামগ্রিক উন্নতির জন্য কেন্দ্র-সরকার দেশে চালু করে কৃষি উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প যেমন Intensive Area Development programme (IADP/1961), Intensive Agriculture Area programme (IAAP/1964-65), High Yielding Variety programme (HYVP/1964) প্রভৃতি গ্রহণ করেন। ভুমি সংস্কার, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় গুরুত্ব বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ, কৃষি বিপণনের উন্নতি, অর্থকরী ফসল চাষে জোর প্রভৃতির মাধ্যমে রাজ্য সরকার ও কৃষির উন্নতিতে মনোনিবেশ করেন। এর ফলে শস্য চাষের ধরনে (Cropping pattern)পরিবর্তন আসে। তাই উৎপাদনে আসে আরও সাফল্য। এই সব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলার কৃষি উৎপাদন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায় ২.২% (১৯৬১-৭১) থেকে ৮.২% (২০০৯-১০) এ। তবে ফসল উৎপাদনের খরচ ও বেড়ে যায় সমান্তরালে।

যান্ত্রিক পর্যায়– অতি সাম্প্রতিককালে (২০১০-২০২০) বাংলার কৃষিতে ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের প্রকল্প ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারন মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, শ্রমিকের বহিঃপরিব্রাজন, আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় কৃষিকাজে মানুষের অনীহা প্রভৃতি কারনে বাংলায় কৃষি শ্রমিকের অভাব ঘটে। উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে তাই শুরু হয় যন্ত্রের ব্যপক ব্যবহার। এতে উৎপাদনের খরচ কিছুটা কমায় সামান্য বৃদ্ধি পায় কৃষকদের নিট মুনাফা।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য-বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে অধিক উৎপাদনের লক্ষে কৃষকেরা উত্তরোত্তর হারে বাড়াতে থাকে কৃষি-রাসায়নিক ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯৬০-৬১ সালে আমাদের রাজ্যে যেখানে ১১.৪ হাজার মে. টন রাসায়নিক সার ব্যবহার হত ২০০৬-০৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১৩৬৫.২ হাজার মেট্রিক টনে (সার সমাচার মার্চ ২০০৮)। বর্ত্তমানে (২০১৭-১৮) এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৫০ সালের তুলনায় ২০০১ সালে এরাজ্যে কৃষি-বিষের ব্যবহার বেড়েছে ৩০ গুন (মুখার্জি- ২০১২)। অন্যদিকে, গৃহ পালিত পশুর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসায় কমতে থাকে জৈব সার ব্যবহারের মাত্রা। অধিক উৎপাদনের লক্ষে প্রায় বন্ধ যায় শস্যাবর্ত্তন ও জমি পতিতকরণ। ফলে কৃষি এখন সম্পূর্ণ রাসায়নিক কৃষি।

সারনী-৪ বাংলা ও ভারতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র।

বছর		১৯৫০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০১০	২০১৭-১৮
ব্যবহৃত সার	প.ব.	DNA	.১২	DNA	২.৮৩	৭.৫৩	১০.৮৫	১৫.৭২	১৫.৫০
(লক্ষ টন)	ভারত	.৬৬	২.৯২	২১.৭৭	৫৫.১৬	১২৫.৪৬	১৬৭.০২	২৮১.২২	২৬৫.৯১

Statistical Abstract, BAE& S and Annual Report 2021-22, Department of Agriculture Govt. of West Bengal, Agricultural Statistics at a glance, 2013, 2018 GoI, New Dehi

DNA: Data Not Available

তুলনামূলক আলোচনা

উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃতিক উপকরণের মাধ্যমে কৃষি-পদ্ধতি পরিচালিত হওয়ায় ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কম ছিল, কিন্তু তা একদিকে ছিল যেমন বিশুদ্ধ তেমনি তখনকার পরিবেশ ও ছিল দূষণমুক্ত। আবার জনসংখ্যা কম থাকায় ওই পরিমাণ খাদ্য শস্যে অভাব ও ঘটেনি সেভাবে। পরবর্তী কালে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন পড়ায় কৃষিতে চালু হয় সার সহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার। এর ফলে উৎপাদন বাড়ে বটে কিন্তু নতুন এক সমস্যা তৈরি হয়। উচ্চ ফলনশীল বীজ ডেকে আনে বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, যা দমনে শুরু হয় কীটনাশকের ব্যবহার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এইসব রাসায়নিকের মাত্রা। তৈরি হয় নতুন এক সমস্যা-পরিবেশের অবনমন। দুষিত হতে থাকে মাটি, জল, বায়ু। ফসল তার নিজস্বতা হারাতে থাকে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলের তুলনায় কমতে থাকে ফসলের স্বাদ ও পুষ্টিমুল্য। শস্য-কনায় সঞ্চিত রাসায়নিক দীর্ঘ দিন ধরে গ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে ক্রমপুঞ্জিভুত হারে তা জমা হতে থাকে। এমনকি মাতৃদুগ্ধে ও মেলে এর অস্তিত্ব। ফলে মানুষ আক্রান্ত হতে থাকে বিভিন্ন ধরনের রোগে।

১৯৭০ এর শেষদিকে বাংলার কৃষিতে শুরু হয় ভৌম-জলের ব্যবহার। বছরভর উৎপাদনের জন্য এর ব্যবহার উত্তরোত্তর হারে বাড়তে থাকে। অন্যদিকে, ভারি-ভারি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মাটির অনুপ্রবেশ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় কমেছে ভু-গর্ভস্থ জলের প্রবেশ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ। এর ফলে বহু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। অধিক ভৌমজলের ব্যবহারে আবার বেড়ে গেছে জলে আর্সেনিকের পরিমান। বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ আর্সেনিক ও fluoride জনিত রোগে আক্রান্ত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ও কীটনাশকের একটা অংশ কৃষি জমির মাটির মধ্যে (Soil residue) থেকে যায়। ক্রমাগত সঞ্চয়ের ফলে মাটির পি এইচ মান ক্রমশ কমতে থাকে (ক্ষেত্র সমীক্ষা)। এর ফলে কৃষকের বন্ধুপোকা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কমে যায় মাটির স্বাভাবিক উর্বর ক্ষমতা ও ফসলের উৎপাদন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সবুজ বিপ্লব শুরুর আগে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আমন ধানের জমিতে সাপ, ব্যাং, কাঁকড়াসহ বিভিন্ন ধরনের চুনো মাছ দেখা যেত কিন্তু, বর্তমানে রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে কৃষিজমিতে মাছ বা কৃষকবন্ধু পোকা আর তেমন একটা দেখা যায় না। আবার অধিক মাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহারে পরাগমিলনকারী পতঙ্গের সংখ্যা ও কমে যাচ্ছে দিন দিন। সময়ের সাথে সাথে কমে

যাচ্ছে ফসলের বিভিন্ন প্রজাতি। কমে যাচ্ছে জীব-বৈচিত্র। প্রভাবিত হচ্ছে খাদ্য শৃঙ্খল। ফলে একটা সময় এর প্রভাব পড়বে পরিবেশ ও কৃষি উৎপাদনে। ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের অংশ বিশেষ জলাশয়ে মিশে জলের পরিপোষক দূষণ ঘটায়। মাটির নীচে থাকা ভৌম জল পর্যন্ত পৌঁছে যায় এর একটি অংশ। জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে তা জল ও বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরনের গ্রীনহাউস গ্যাস উৎপন্ন করে যা সরাসরি বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়ে বায়ু-দূষণ ঘটায়।

রাসায়নিক সার, কীটনাশক বা যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহারে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে বটে কিন্তু পাল্লা দিয়ে বেড়েছে উৎপাদনের খরচ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এক একর পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করতে আগে জমি কর্ষণ, শ্রমিকের মজুরি, সার, নিড়ানি, ফসল ঝাড়ায় করে ঘরে তোলা প্রভৃতি কাজে যে পরিমাণ খরচ হত, তা আধুনিক কৃষিতে ২.১ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে তবে বর্ত্তমানে (যান্ত্রিক পর্যায়ে) তা খানিকটা কমে ২ গুনে দাঁড়িয়েছে (উৎস -ক্ষেত্র সমীক্ষা)। ফলে উৎপাদন বেশি হওয়া সত্ত্বেও খানিকটা বেড়েছে কৃষকদের নিট লাভের পরিমাণ।

সারনী-৪: উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধান চাষ করে পাওয়া আয়-ব্যয় (বর্ত্তমান বাজার দরে) এর হিসাব

কৃষির পর্যায় সমূহ	একর পিছু ধান উৎপাদনে			পরিবেশে প্রভাব
	মোট আয়	মোট খরচ	নিট লাভ	
গতানুগতিক	১২৫০০	১১৫০০	১০০০	নেই
আধুনিক	৩১২৫০	২৩৭৫০	৭৫০০	পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ
যান্ত্রিক	৩৩৭৫০	২৩০০০	১০৭৫০	পরিবেশ আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ

উৎস -ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে গণনা।

চিত্র- ৩-বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষির তুলনামূলক আয়-ব্যয়।

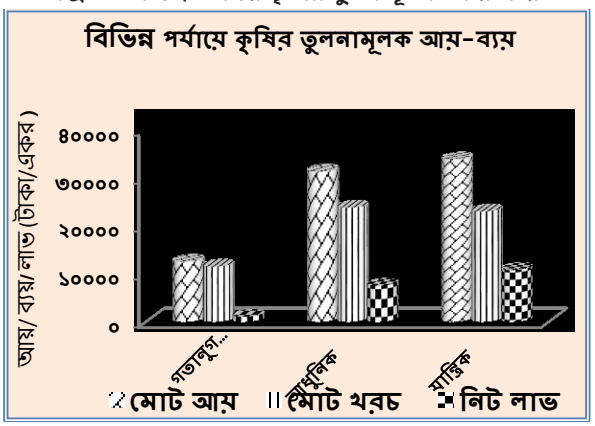

উপসংহার

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিকাজ বাঙ্গালীর প্রধান জীবিকা। বাংলার অর্থনীতি ও তাই কৃষিভিত্তিক। প্রাচীন বাংলায় অত্যন্ত সেকেলে ভাবে পরিচালিত হত এই কাজ। সামান্য কিছু জৈবসার ব্যবহৃত হত উৎপাদনে। স্বাধীনোত্তর কালে দেশ তথা রাজ্যের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে খাদ্য ফসলের চাহিদা ও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বাড়াতে বাজারে আসে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার, যন্ত্রপাতি ও কীটনাশক। শুরু হয় সবুজ-বিপ্লব। এতে

উৎপাদন বাড়ে বটে কিন্তু সমান্তরালে বেড়ে যায় উৎপাদনের খরচ। সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত কমতে থাকে কৃষকদের নিট লাভের পরিমাণ। ২০১০ পরবর্তী সময়ে বাংলার কৃষিতে ঘটে যান্ত্রিকীকরণ। সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে দেশের কৃষি স্বাবলম্বী হলেও তা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রশ্নের সামনে দাড় করিয়ে দেয়। অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে জল, মাটি, বায়ু সহ পরিবেশের সমস্ত উপাদান ক্রমশ দুষিত হতে থাকে। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত এইসব রাসায়নিক ফসলের মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে মানব শরীরে। কৃষিতে অতিরিক্ত ভৌম-জলের ব্যবহারে কমতে থাকে এর গুণমান ও সঞ্চয়। জলে বাড়তে থাকে আর্সেনিক ও fluoride এর মাত্রা। বাংলার বহু এলাকার মানুষ আজ বিশুদ্ধ পানীয়জল থেকে বঞ্চিত। দূষণের এই যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে গতানুগতিক ও আধুনিক কৃষির মেলবন্ধন ঘটানো দরকার। এর জন্য চাই কৃষিতে রাসায়নিক ও জৈব সারের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহার এবং সুসংহত উপায়ে কীট দমন। এতে একদিকে যেমন কৃষকদের খরচ বাঁচবে তেমনি রক্ষা পাবে পরিবেশের উপাদান গুলি।

চিত্র-৩ : বিভিন্ন সময়ে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার কৃষি চিত্র

(১) গতানুগতিক পর্যায়

(২) আধুনিক পর্যায়

(৩) যান্ত্রিক পর্যায়

গ্রন্থ তালিকা-

১. Annual Report (2021-22), Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare Government of India Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 www.agricoop.nic

২. কৃষির অগ্রগতিঃ ধারাবাহিক সাফল্যের ইতিবৃত্ত (২০০২), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃবঃ সরকার

৩. জানা বি. (২০০৪), "আধুনিক কৃষিতে জৈব-জীবানুসার এবং জৈবিক চাষ-বাসের গুরুত্ব", ভারতী বুক স্টল, কলকাতা।

৪. পঃবঃ সরকার, (২০০২), "কৃষির অগ্রগতিঃ ধারাবাহিক সাফল্যের ইতিবৃত্ত", তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

৫. মুখার্জি এন. (২০১২), "বাংলার কৃষির ইতিবৃত্ত", ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা।

৬. মজুমদার এম. (২০০১), "মৃত্তিকা, সার ও ফসল", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৭. মাইতি আর (২০০১) "পরিবেশ ও উৎপাদন রক্ষায় জৈব কৃষি", সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৮. মুখোপাধ্যায় এস. (১৯৯৩), "কৃষিতে রাসায়নিক দূষণ ও বিকল্প", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৯. "সার সমাচার" (মার্চ ২০০৮), ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, পূর্বাঞ্চলীয় শাখা।

১০. সিনহা গোপাল চন্দ্র (২০০১), (বাংলা), "ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)", প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ISBN- ৮১৮৬৩৮৩২৯৮

১১. "Fertilizer Use and Environment Quality (1965)", The Fertilizer Association of India, New De